THE IMPRESSION, A Journal on Multidisciplinary Studies, A Peer Reviewed Journal
Annual Issue (2019) (ISSN: 2278-2699)

রবীন্দ্র কাব্যনাট্য ও প্রতিবাদ

ড. কৃষ্ণা ঘোষ *

রবীন্দ্রনাথের শেষ কাব্য 'নবজাতক'- এ কবি তাঁর কাব্যের বারবার ঋতু পরিবর্তনের কথা বলেছেন - "আমার কাব্যের ঋতু পরিবর্তন ঘটেছে বারে বারে, প্রায় সেটা ঘটে নিজের অলক্ষ্যে।কালে কালে ফুলের ফসল বদল হয়ে থাকে তখন মৌমাছির মধু জোগান নতুন পথ নেয়। ফুল চোখে দেখবার পূর্বেই মৌমাছি ফুল গন্ধের সূক্ষ্ম নির্দেশ পায়, সেটা পায় চারদিকের হাওয়ায়। যারা ভোগ করে এই মধু তারা এই বিশিষ্টতা টের পায় স্বাদে, কোন কোন বনের মধু বিগলিত তার মাধুর্যে, তার রঙ হয় রাঙ্গা, কোন পাহাড়ি মধু দেখি ঘন, আর তাতে রঙের আবেদন নেই, সে শুভ্র, আবার কোন অরণ্যে সঞ্চয়ে একটু তিক্ত স্বাদেরও আভাস থাকে।" রবীন্দ্র নাটকের ক্ষেত্রেও তা সমভাবে প্রযোজ্য। তাঁর প্রথম নাট্য রচনা 'বাল্মিকী প্রতিভা'- গীতিনাট্য। এরপর কাব্যনাট্য, নাট্যকাব্য, নৃত্য নাট্য, তত্ত্বনাটক, রূপক সাংকেতিক নাটক প্রভৃতি রচনার মধ্য দিয়ে নতুন নতুন দিক উন্মোচিত হয়েছে। নাটকের রূপ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিষয়বস্তু ও ভাব পরিমণ্ডলের ক্ষেত্রেও তিনি যুগান্তর ঘটাতে চেয়েছিলেন। আবার 'ভগ্নহৃদয়'-র ভূমিকায় বললেন - "নাটক ফুলের গাছ। তাহাতে ফুল ফোটে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে মূল কাণ্ড শাখা পত্র এমনকি কাঁটাটি পর্যন্ত থাকা চাই।"

কিছু কিছু রবীন্দ্রনাথের নাটকে কাব্যরস ও নাট্যরসের মেলবন্ধন ঘটেছে। এগুলির মধ্যে কাব্যের মন্ময়তা, আবেগ ও কল্পনার সঙ্গে নাটকের তন্ময়তা, দ্বন্দ্ব - সংঘাত, চরিত্র ও ঘটনার চমক - একই সূত্রে আবদ্ধ। রবীন্দ্র কাব্য নাট্যগুলি কাহিনী ও নাটকের অপূর্ব মিশ্ররীতি। তাঁর কাব্যনাট্য গুলিতে বিভিন্ন চরিত্রের অন্তমুখী ভাবের প্রবণতা কিভাবে ভিন্নধর্মী প্রতিবাদের রূপ লাভ করেছে - তার পরিচয়ই আমাদের মুখ্য প্রতিপাদ্য। এই নাটকগুলির বিষয়বস্তুতে ঘটনার সমগ্রতা নয় - ঘটনার এক একটি খণ্ড চিত্র পঞ্চাঙ্ক নাটকের শেষ অঙ্কের সঙ্গে মিশে এক অপূর্ব নাট্যরস সৃষ্টি করেছে।

২

রবীন্দ্রনাথের প্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্যনাট্য 'চিত্রাঙ্গদা'। কাব্যটির মূল কাহিনী সংগ্রহ করা হয়েছে মহাভারতের আদিপর্ব থেকে। মনিপুর রাজত্বে স্বেচ্ছা নির্বাসনের সময় সেখানকার রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদার সঙ্গে অর্জুনের বিয়ে হয়। মহাভারতের এই কাহিনী কিছু আনুপূর্বিক পরিবর্তন করে রবীন্দ্রনাথ কাব্যনাট্যের শুরুতেই চিত্রাঙ্গদা ও অর্জুন দুজনকেই এক অবাস্তব কল্প জগতে নিয়ে গেছেন। যা মানব স্বভাবের উপর আরোপিত কোন কল্পনামাত্র। কিন্তু ঘটনা প্রবাহে তারা যখন দুজনে সামনাসামনি এসে দাঁড়ালো - তখন তাদের সমস্ত মোহের মায়াজাল ত্যাগ করে তারা তাদের নিজস্ব সত্তায় ফিরে যেতে চাইল। পুরুষ বেশধারী

* সহকারী অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ, পানিহাটি মহাবিদ্যালয়, সোদপুর, কলকাতা - ৭০০১১০

চিত্রাঙ্গদার যে আত্ম অহংকার ছিল -

"মোর পিতৃ বংশে কভু পুত্রী জন্মিবে না-
দিয়া ছিলা হেন বর দেব উমাপতি
তবে তুষ্ট হয়ে। আমি সেই মহাবর
ব্যর্থ করিয়াছি।"

অর্জুন যেদিন পুরুষ বেশধারী চিত্রাঙ্গদাকে প্রত্যাখ্যান করল সেদিন চিত্রাঙ্গদা বুঝতে পারল মানব স্বভাবের বিরুদ্ধে কোন কাজে আত্মতৃপ্তি নেই। তখন সে মদন ও বসন্তের কাছে রূপ যৌবন কামনা করল। অর্জুন নির্বাসন কালে মানব প্রকৃতির বিরুদ্ধাচারণ করে ব্রহ্মচারী বেশ ধারণ করেছিল, ব্রহ্মচারী গৌরবের জন্যই সে প্রথমবার চিত্রাঙ্গদা কে প্রত্যাখ্যান করেছিল। পরবর্তীতে অর্জুন সেই ব্রহ্মচারী ব্রত ভঙ্গ করতে বাধ্য হল। এইভাবে অর্জুন চিত্রাঙ্গদা পরস্পরকে এক অতি নাটকীয় মোহবশে আবদ্ধ করল।

চিত্রাঙ্গদা নিজের সত্য কুরূপকে ঢাকার জন্য যে রোমান্টিক মায়ার সাহায্য নিয়েছিল, অবশেষে চিত্রাঙ্গদাকেই তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হলো- যা বাস্তবতার বিরুদ্ধাচরণ। মদন বসন্তের বরে অর্জুন সুরূপা চিত্রাঙ্গদাকে প্রেম নিবেদন করতে এলে, সে মনে মনে ঈর্ষান্বিত হয়েছে।

".....মিথ্যারে কোরো না
উপাসনা। শৌর্য বীর্য মহত্ব তোমার
দিও না মিথ্যার পদে।"

মিথ্যা বলতে এখানে চিত্রাঙ্গদা নিজের বিরুদ্ধ রূপকে বুঝিয়েছে। অর্জুন চিত্রাঙ্গদার আসল রূপকে ভালো না বেসে, ভিক্ষালব্ধ নকল রূপকে ভালোবেসেছে। সৌন্দর্যহীন সত্য রূপকে, মিথ্যে সৌন্দর্যের আবরণে ঢেকে চিত্রাঙ্গদা অর্জুনকে কামনা করেছিল, কিন্তু আজ বুঝতে পারল সৌন্দর্যহীন সত্য মিথ্যা সৌন্দর্যের থেকে অনেক গুন বড়। ভালো বা মন্দ যাই হোক না কেন বাস্তব সত্য আমাদের কাছে অনেক বেশি বাঞ্ছনীয়। দেবতাদের কাছে যে বর পেয়ে সে একদা নিজেকে সৌভাগ্যবতী বলে মনে করেছিল, আজ তা ফিরিয়ে দেবার জন্য সে ব্যাকুল হয়ে উঠল। মদন তাকে বলল চিত্রাঙ্গদা রূপ ফিরিয়ে নিলে অর্জুন কি তাকে পরিত্যাগ করবে না? প্রত্যুত্তরে চিত্রাঙ্গদা বলল -

"সেও ভালো। এই ছদ্ম রূপিনীর চেয়ে
শ্রেষ্ঠ আমি শতগুনে। সেই আপনারে
করিব প্রকাশ, ভালো যদি নাই লাগে,
ঘৃণা ভরে চলে যান যদি, বুক ফেটে
মরি যদি আমি, তবু আমি, আমি রব।"

এইভাবে চিত্রাঙ্গদা নিজের মিথ্যা আরোপিত সৌন্দর্যের প্রতি নিজেই প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছে। নিজের অপরাধের বিরুদ্ধে নিজেই সোচ্চারে প্রতিবাদ করে উঠলো।

৩

'বিদায় অভিশাপ'- এর কাহিনী সংগ্রহ করা হয়েছে মহাভারতের আদি পর্ব থেকে। বৃহস্পতির পুত্র কচ দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের কাছে মৃত সঞ্জীবনী বিদ্যা শিখতে আসে। শুক্রাচার্য পরম যত্নে কচকে বিদ্যা শিক্ষা দেন। গুরুকন্যা দেবযানীও বহু বছর ধরে কচের সেবায় আত্মনিয়োগ করে। দৈত্যরা বারবার কচকে নিহত করলে দেবযানীর অনুরোধে শুক্রাচার্য তার প্রাণ ফিরিয়ে দেয়। অবশেষে শিক্ষা শেষে কচ স্বর্গে ফিরে যেতে চাইলে দেবযানী তাকে তাদের প্রেমের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় -

"হায় বন্ধু, এ প্রবাসে
আর কোনো সহচরি ছিল তব পাশে,
পর গৃহ দুঃখ বাস ভুলাবার তরে
যত্ন তার ছিল মনে রাত্রি দিন ধরে;
হায়রে দুরাশা!"

বিদায়বেলায় দেবযানী প্রেমাস্পদকে পাওয়ার জন্য নিজেকে মৃত সঞ্জীবনী বিদ্যার প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে তুলে ধরে কচের কাছে জানতে চায়, তার কাছে কে বেশি গ্রহণীয় -

"আজ মোরা দোঁহে একদিনে
আসিয়াছি ধরা দিতে। লহ সখা চিনে
যারে চাও। বল যদি সরল সাহসে
বিদ্যায় নাহিক সুখ, নাহি সুখ যশে,
দেবযানী , তুমি শুধু সিদ্ধি মূর্তিমতী,
তোমারেই করিনু বরণ - নাহি ক্ষতি,
নাহি কোনো লজ্জা তাহে; রমণীর মন
সহস্র বর্ষেরই সাধনার ধন।"

দেবযানী কচকে অভিশাপ দিয়েছে যে সে সঞ্জীবনী বিদ্যা শিখতে পারবে কিন্তু প্রয়োগ করতে পারবে না। প্রত্যুত্তরে কচ দেবযানীকে আশীর্বাদ করে এক ক্ষমা সুন্দর মনের পরিচয় দিয়েছে।-

"আমি বর দিনু, দেবী, তুমি সুখী হবে-
ভুলে যাবে সর্বগ্লানি বিপুল গৌরবে।"

রবীন্দ্রনাথ কচ চরিত্রের মধ্য দিয়ে আধুনিক যুগ মানসের অনুবর্তী এক প্রতিবাদী পুরুষ চরিত্রের প্রতিফলন ঘটিয়েছেন।

৪

পাঞ্চালের পুরু বংশের রাজা সোমকের কাহিনী রবীন্দ্রনাথের হাতে নতুন তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে 'নরকবাস' কাব্যনাট্যটিতে। রাজা সোমকের একশত স্ত্রী ছিল। তাদের কোন সন্তান ছিল না। অবশেষে বহু যজ্ঞ করে সে একটি পুত্র লাভ করে। রাজা এই পুত্রের জন্য সদাই উৎকণ্ঠিত থাকতো। এই কারণে প্রধান পুরোহিত ঋত্বিক রাজাকে পরামর্শ দেয় যে, বিরাট এক যজ্ঞ করে রাজা তাতে নিজে পুত্রকে আহুতি দিয়ে, সেই যজ্ঞ কুণ্ডের ধোয়া গ্রহণ করলে রানীদের শত পুত্র হবে। রাজা পুরোহিতের কথা মত নিজ হাতে পুত্রকে আহুতি দেয়। পরবর্তীকালে মৃত্যুর পর ঋত্বিকের স্থান হয় নরকে। রাজার মৃত্যুর পর স্বর্গে যাবার পথে ঋত্বিকের সঙ্গে দেখা হয়। ঋত্বিক রাজাকে স্বর্গে না যেতে অনুরোধ করে। রাজা ঋত্বিকের কথা শুনে ধর্মকে জানায়, সেও পুরোহিতের সঙ্গে নরকবাস করবে। ধর্ম তাতে অনুমতি দেয়।রাজা সোমক পুত্রকে আত্মহুতি দেওয়ার পর প্রচন্ড আত্মগ্লানিতে অনুতপ্ত হতে থাকে, ফলে তার আত্মশুদ্ধি হয়। তাই তার ঠাঁই হয় স্বর্গবাসে। এ সত্ত্বেও বহু বছর ধরে আত্মযন্ত্রণা ভোগ করার পরও সে পুরোহিতকে ত্যাগ না করে তার অনুগামী হয়।

"তব সাথে মোর গতি নরক - মাঝারে
হে ব্রাহ্মণ! মত্ত হয়ে ক্ষাত্র অহংকারে
নিজ কর্তব্যের ত্রুটি করিতে স্খলন
নিষ্পাপ শিশুর মোর করেছি অর্পণ

হুতাশনে, পিতা হয়ে।"

সোমক তার পরমতম শত্রুর সঙ্গে নরক বাস করতে সম্মত হল। অন্তরের নরকাগ্নির সঙ্গে বাইরের নরকাগ্নি মিলিত হল। অন্তর দ্বন্দ্বের সঙ্গে বহিঃ দ্বন্দ্বের বিরহ বেদনা মিলেমিশে এক হয়ে গেল। প্রতিবাদের স্থানে ক্ষমা সুন্দর উদারতা নরকের প্রেতগনকেও অভিভূত করে তুলল।-

"জয় জয় মহারাজ পুণ্যফলত্যাগী
নিষ্পাপ নরকবাসী, হে মহা বৈরাগী
পাপীর অন্তরে করো গৌরব সঞ্চার
তব সহবাসে। করো নরক উদ্ধার।"

৫

'গান্ধারীর আবেদন'- এ মহীয়সী রানী গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রের কাছে দুর্যোধনকে ত্যাগ করার আহ্বান জানিয়েছে। দুর্যোধন যে অন্যায় ও মিথ্যাচার নিয়ে পাশা খেলায় জয়লাভ করেছে এবং দ্রৌপদীকে সে অপমান করেছে। সেই অপরাধের প্রতিবাদে গান্ধারী, দুর্যোধনকে ত্যাগ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেনি। এ কাব্যনাট্যে গান্ধারী চরিত্রটি তাঁর হাতে এক নতুন মহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। পাশাপাশি ধৃতরাষ্ট্র চরিত্রটি অপ্রধান হলেও, এখানে সে নায়ক হয়ে উঠেছে। অন্তরে বাইরে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র চরিত্রে পুত্রের জন্য ধর্মত্যাগের গ্লানি আছে। আর এই বেদনাই তাকে ট্রাজিক চরিত্রে উন্নীত হতে সাহায্য করেছে। গান্ধারী পাপাচারী পুত্রদের নির্বাসনের আদেশের জন্য ধৃতরাষ্ট্রের কাছে আবেদন করেছে। -

"তুমি রাজা, রাজ - অধিরাজ
বিধাতার বামহস্ত; ধর্মরক্ষা - কাজ
তোমার পরে সমর্পিত।"

ধৃতরাষ্ট্রের কাছে আবেদন করে তিনি বুঝতে পারলেন তার আবেদন গ্রাহ্য হওয়ার নয়। এবার তিনি বিধাতার কাছে তার দন্ডের আবেদন করলেন -

"হে আমার
অশান্ত হৃদয় স্থির হও। নতশিরে
প্রতীক্ষা করিয়া থাকো বিধির বিধিরে
ধৈর্য ধরি।"

বিধাতা যখন দন্ড দেবেন তখন সেই দন্ড শুধুমাত্র দুর্যোধনকে আঘাত করবে না - পাপী, পাপের ফলভোগী, যারা পাপকে বাধা দেয়নি, তাদের সকলকেই তা শাসন করবে।

"তার পরে যাবে
গগনে উড়বে ধূলি, কাঁপিবে ধরণী,
সহসা উঠিবে শূন্যে ক্রন্দনের ধ্বনি
হায় হায় হা রমনী, হায় রে অনাথা,
হায় হায় বীর - বধূ, হায় বীর - মাতা,
হায় হায় হাহাকার - তখন রুধিবে
মুদিয়া নয়ন।"

এ সত্ত্বেও গান্ধারীর প্রতি আমরা একাত্মতা অনুভব করি না। অন্যদিকে অন্তরে বাহিরে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র, যে কিনা শত বিপদের দিনেও অপরাধী পুত্র দুর্যোধনকে পরিত্যাগ করে ধর্ম রক্ষা করতে চায় না। কারণ-

"পাপী পুত্র ত্যাজ্য বিধাতার,
তাই তারে ত্যাজিতে না পারি, আমি তার
একমাত্র; উন্মত্ত তরঙ্গ - মাঝখানে
যে পুত্র সঁপেছে অঙ্গ তারে কোন প্রাণে
ছাড়ি যাব।"

ধৃতরাষ্ট্রের কাছে ধর্ম, বিধাতা - এসব কিছুর শেষ কথা অতি কঠোর বাস্তববোধ।

"এখন তো আর

বিচারের কাল নেই, নাই প্রতিকার,
নাই পথ, ঘটেছে যা ছিল ঘটিবার,
ফলিবে যা ফলিবার আছে।"

৬

'কর্ণ কুন্তী সংবাদ' এর কাহিনী শুরু হয়েছে অর্জুনের সঙ্গে কর্ণের যুদ্ধের পূর্ব দিনের সন্ধ্যায় কুন্তীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার দিয়ে। কুন্তী, কর্ণকে নিজের পরিচয় দিয়ে, কর্ণের জন্ম বৃত্তান্ত বর্ণনা করে, কর্ণকে আপন ভ্রাতাদের সঙ্গে যোগদান দেওয়ার কথা বলেছেন। আজন্ম মাতৃস্নেহহীন কর্ণের হৃদয় বিগলিত হয়ে উঠে মা ও ভ্রাতাদের সঙ্গে পাওয়ার জন্য কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে বীরসত্তা জেগে উঠলো। বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা তার জীবনের চরম লক্ষ্য। আজ বহু বছর পর সেই সুযোগ আসন্ন। কর্ণ কোন ক্রমেই তা থেকে বিচ্যুত হতে পারে না। কুন্তী নিজের পরিচয় দিয়ে বলল -

"কহি তোরে বীর
কুন্তী আমি।"

কুন্তী, কর্ণকে ফিরে পাবার জন্য ধীরে ধীরে মাতৃস্নেহ, ভ্রাতৃস্নেহ প্রভৃতির কথা বলেছে, তখন আত্মজদের থেকে বঞ্চিত কর্ণের বুভুক্ষু হৃদয় অনুভব করেছিল -

"তোমার আহ্বানে
অন্তরাত্মা জাগিয়াছে; নাহি বাজে কানে
যুদ্ধভেরী, জয়শঙ্খ, মিথ্যা মনে হয়
রণহিংসা, বীরখ্যাতি, জয় পরাজয়।"

যখনই কুন্তী সিংহাসনের কথা বলেছে, তখনই কর্ণের সব মোহ ভেঙ্গে গেছে -

"সিংহাসন! যে ফিরালো মাতৃস্নেহ পাশ
তাহারে দিতেছ মাতঃ রাজ্যের আশ্বাস!"

অবশেষে মাতা কুন্তীকে সান্ত্বনা দিয়ে, নিজের সমস্ত গ্লানিকে হৃদয়ে চেপে রেখে, মাতৃত্বের জয় ঘোষণা করেছে কর্ণ -

"মাতঃ করিও না ভয়।
কহিলাম, পাণ্ডবের হইবে বিজয়।
শুধু এই আশীর্বাদ দিয়ে যাও মোরে-
জয়লোভে, যশোলোভে, রাজ্যলোভে, অয়ি বীরের সদগতি হতে ভ্রষ্ট নাহি হই।"

শেষ মুহূর্তে সে বীরত্ব, পৌরুষ ও ধর্মের মধ্যেই জীবনের চরম প্রাপ্তি খুঁজে পেয়েছে।

রবীন্দ্র কাব্যনাট্য গুলির মধ্যে 'নরকবাস' 'গান্ধারীর আবেদন' 'কর্ণ কুন্তী সংবাদ' প্রভৃতির চরিত্রগুলি ধর্মকে আশ্রয় করে মহত্তর হয়ে উঠেছে। গান্ধারীর আবেদনে সন্তানকে পাপের পথ থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য ধর্মকে অবলম্বন করা হয়েছে। আবার রাজা সোমক ধর্ম রক্ষার জন্য নিজের সন্তানকে হোমানলে আহুতি দিয়েছিল। কর্ণ তার আজন্ম স্বপ্নে দেখা মাতা ও ভ্রাতাদের মধ্যে ফিরতে পারল না শুধুমাত্র ধর্ম রক্ষার জন্য। কর্তব্যনিষ্ঠ ধর্মই বুঝি তার জীবনের মূল লক্ষ্য। এইভাবে রবীন্দ্র কাব্যনাট্যগুলিতে ধৃতরাষ্ট্র, কর্ণ, রাজা সোমক, অর্জুন প্রভৃতি চরিত্রগুলি তাদের পৌরষত্ব, ন্যায়ধর্ম, ও সত্যকে যেমন তাদের প্রতিবাদের ভাষা রূপে ব্যবহার করেছে তেমনি নারী চরিত্র গুলির মধ্যে গান্ধারী, কুন্তী, চিত্রাঙ্গদা, দেবযানী - তাদের নারীত্বের পূর্ণ মর্যাদা নিয়ে স্বমহিমায় যুগোপযোগী প্রতিবাদের ভাষায় মুখর হয়ে উঠেছে।

তথ্যসূত্র:

১) রবীন্দ্র নাট্য পরিক্রমা - শ্রী অশোক সেন।

২) রবীন্দ্র নাট্য সাহিত্যের ভূমিকা - ড. সাধন কুমার ভট্টাচার্য।

৩) সঞ্চয়িতা - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৪) রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয় - ক্ষুদিরাম দাস।

৫) রবীন্দ্র নাট্য প্রবাহ - প্রমথনাথ বিশী।

৬) প্রসারিত রবিচ্ছায় - উজ্জ্বল কুমার মজুমদার।

৭) রবীন্দ্র নাট্য পরিক্রমা - উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।

৮) নাট্য নিরীক্ষণ: মঞ্চদর্পণে - পুলিন দাস।

THE IMPRESSION, A Journal on Multidisciplinary Studies, A Peer Reviewed Journal
Annual Issue (2019) (ISSN: 2278-2699)

‘অর্ধেক মানবী’ – র পূর্ণতার খোঁজে : এক মগ্ন পাঠকের অন্য রবীন্দ্রপাঠ

ড: পিয়ালি দে মৈত্র*

সারসংক্ষেপ: সাহিত্যরসিক মানুষের কাছে শিক্ষাবিদ,প্রাবন্ধিক,কবি ও সাহিত্যসমালোচক সুতপা ভট্টাচার্যের নাম সুবিদিত। তাঁর কাছে যে রবীন্দ্র-সাহিত্যপাঠ এক ভিন্নমাত্রা পেয়ে যায়, সেকথা তাঁর বন্ধু, আত্মজন এবং ছাত্রছাত্রীরা সকলেই জানেন। রবীন্দ্র-সাহিত্যের এই মগ্ন পাঠক যখন কলম তুলে নেন সাহিত্যসমালোচক হিসেবে, তখন চিরচেনা গল্প-কবিতা-উপন্যাস-নাটক-প্রবন্ধ এক ভিন্ন উদ্ভাসে দীপ্ত হয়ে ওঠে আমাদের চোখের সামনে। বলাই বাহুল্য, সুতপা ভট্টাচার্যের এই পাঠ বিশ্লেষণ নারীবাদী দৃষ্টিকোণে ঋদ্ধ। তিনি অবিরত নারীর পূর্ণতার খোঁজ করে চলেন তাঁর একের পর এক গ্রন্থে। সেইসব অন্বেষণের খোঁজটুকুর মধ্যেই আমরা চিনে নিতে পারি গবেষকের নিষ্ঠাকে।

সূচক শব্দঃ ‘ সে নহি নহি,’ ‘মেয়েলি পাঠ’, ‘মেয়েলি সংলাপ’,‘মেয়েলি আলাপ’, ‘যোগাযোগের পরের কথা’, ‘অপন্ডিতের পাঠ’, সুতপা ভট্টাচার্যের কলম, নারীবাদী দৃষ্টিকোণ।

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মহাবিদ্যালয়, হাবড়া, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারতবর্ষ।

মূল প্রবন্ধ:

সুতপা ভট্টাচার্য বাংলাসাহিত্যের বিদ্যায়তনিক চর্চার সঙ্গে যুক্ত প্রায় সকলের কাছেই এক পরিচিত নাম। বিশ্বভারতীর বাংলাবিভাগের প্রাক্তন এই অধ্যাপক একইসঙ্গে শিক্ষাবিদ, প্রাবন্ধিক, কবি ও সাহিত্যসমালোচক। তাঁর ছাত্রছাত্রী এবং আত্মজনেরা জানেন যে, রবীন্দ্র- সাহিত্যের এই মগ্ন পাঠকের কাছে রবীন্দ্র-সাহিত্যপাঠ এক ভিন্ন মাত্রা পেয়ে যায়। তিনি নিজেই বলেছেন – "একদিন রবীন্দ্রনাথ থেকেই শুরু করেছিলাম ভাবতে।পুরুষের মতো মেয়েদেরও যে আত্মস্বরূপ-সন্ধানের গরজ আছে, সেকথা তো রবীন্দ্রনাথ থেকেই জেনেছি।আজকের দিনের নারীবাদী ভাবনার কোনো কোনো মৌলিক প্রশ্ন তাঁর সাহিত্যে উচ্চারিত হয়েছে দেখেছি। আবার অন্যদিকে তাঁর কবিতাতে এমন পঙক্তিও পাই : 'অর্ধেক মানবী তুমি অর্ধেক কল্পনা'; অথচ অর্ধেক তো নয়, সম্পূর্ণ মানবীই তো হতে চাই আমরা, তার তাগিদেই বুঝে নিতে চাই সেই 'অর্ধেক কল্পনার' মানচিত্র।"[১] তাঁর এই তাগিদ থেকেই তিনি তাঁর বিশ্লেষণী দক্ষতায় রবীন্দ্রনাথ থেকে অনেকটা পথ এগিয়ে আসতে পারেন। শুধু তাই নয়, প্রশ্ন তোলেন অনায়াসেই " মৌলিক ক্ষমতা-কাঠামো সম্বন্ধেই।"[২] হয়তো সেকারনেই বিভিন্ন প্রবন্ধ সংকলনে রবীন্দ্র-সাহিত্যকে ঘিরে তাঁর লেখাগুলির নাম হয় এইরকম—

ক) লিঙ্গ রাজনীতি এবং রবীন্দ্রনাথ
খ) 'রক্তকরবী'-র দুই নারী
গ) বিবাহ প্রতিষ্ঠান: রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিকোণ
ঘ) রবীন্দ্রনাথের নাটকে মেয়েরা
ঙ) রবীন্দ্রনাথ আর ভিকতোরিয়া ওকাম্পো
চ) মাতৃত্বের মোড়ক – রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিকোণ
ছ) 'যোগাযোগ'- এর পরের কথা
জ) রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প – একটি সংক্ষিপ্ত মানচিত্র
ঝ) নারীভাবনা – রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্র ইত্যাদি।

'সে নহি নহি' সুতপা ভট্টাচার্যের সুপরিচিত গ্রন্থ। এই বইটির প্রথম সংস্করণটি প্রকাশিত হয়েছিল ' বিশ্বভারতী গবেষণা প্রকাশন বিভাগ' থেকে ১৯৯০ সালে। আমার তখন ছাত্রীজীবন। সে সময় একটু একটু করে রবীন্দ্রনাথ অধিকার করছেন মনোভূমি। সর্বক্ষণ তাঁর গানে, কবিতায় মগ্ন হয়ে আছি। নেহাতই অপরিণত বোধ-বুদ্ধিতে, তর্ক-বিতর্কে বন্ধুদের আড্ডা সরগরম হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের নাটক, উপন্যাস, ছোটোগল্প নিয়ে। 'সে নহি নহি' (প্রথম সংস্করণ) হাতে এসেছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের গন্ডি অতিক্রম করার পর। বইটি পড়তে পড়তে চমকে উঠেছিলাম এমনভাবেও ভাবা যায়!! এ যেন এক নতুন রবীন্দ্রপাঠ। মনে আছে, দ্রুত বইটি পড়ে শেষ করেছিলাম এবং বেশ কয়েকজনকে পড়তেও দিয়েছিলাম – যাতে আমার অনুভবটুকু ভাগ করে নেওয়া যায়। সেই নষ্টালজিক অনুভূতিই আবার ফিরে এসেছিল দ্বিতীয় সংস্করণটি হাতে পেয়ে। এটির প্রকাশকাল ২০০৪, প্রকাশক সুবর্ণরেখা। প্রায় চোদ্দ বছরের ব্যবধান বইদুটির প্রচ্ছদ থেকে শুরু করে বিষয়বিন্যাস পর্যন্ত সর্বত্রই ছাপ ফেলেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, প্রথম সংস্করণে 'নারীমুক্তি, কৃষ্ণভাবিনী ও রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক রচনাটির কাব্যবিষয় দ্বিতীয় সংস্করণে ' লিঙ্গ-রাজনীতি এবং রবীন্দ্রনাথ' অধ্যায়ে সংযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। সমালোচক লিখলেন – " স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ক যে রাজনীতির সম্পর্ক – এটুকু বুঝেছিলেন তিনিও।"[৩] নারীশিক্ষা নিয়ে কৃষ্ণভাবিনীর সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক প্রসঙ্গে সুতপা ভট্টাচার্যের বিশ্লেষণটি এইরকম – " কৃষ্ণভাবিনী নারীশিক্ষা চান নারীর জন্যই। আর রবীন্দ্রনাথ যখন স্ত্রী- স্বাধীনতার কথা বলেন, তখন বলেন

পুরুষের ' সুখ ও উন্নতির' দিকে তাকিয়ে।"[৪] নারীমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ অধ্যায়ে স্পষ্টই বলা হয়েছে – " রবীন্দ্রনাথের মুক্তিচিন্তা মেটাফিজিক্স এর মাত্রা পেয়ে যায় বলে বাস্তব প্রশ্নের মীমাংসা করা তাঁর কাছে জরুরী হয়ে ওঠে না। নোরাকে যেমন পরবর্তী জীবনের পরিকল্পনা করে নিতে হয়, মৃণালের সেদিক দিয়ে কোন চিন্তাভাবনা নেই। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ব্যতীত নারীর মুক্তি যে অসম্ভব, এঙ্গেলস্ যেভাবে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, সে সমস্যা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিরুত্তর।"[৫]

সেই উত্তরের অন্বেষণেই হয়তো আরও আটবছর পরে সুতপা ভট্টাচার্য লিখে ফেলেন এমন একটি লেখা, যার নাম "যোগাযোগ- এর পরের কথা"[৬]। 'মেয়েলি আলাপ' (প্রকাশকাল – ২০১২) নামক গ্রন্থটিতে আছে এই রচনাটি। ঋতদীপা নামে একটি কাল্পনিক চরিত্রের কাল্পনিক ডায়ারির মাধ্যমে কয়েকটি বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধকে একসূত্রে গাঁথা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ' উপন্যাসের কুমুদিনীকে সংসার পরিত্যাগের পরিকল্পনাকে বাতিল করে সংসারে ফিরতে হয়েছিল সন্তান- সম্ভাবনার কারণে। এই রচনায় সেই কুমুদিনীর এক কাল্পনিক ভবিষ্যতের ছবি আকাঁ হয় যেখানে এঙ্গেলস্- চিহ্নিত অর্থনৈতিক স্বাধীনতার পরেও আজকের কুমুদিনীদের একাকীত্ব, ভালোবাসার প্রবঞ্চনা এবং অসহায়তার ছবি ধরা পড়েছে। সুতপা ভট্টাচার্যের দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট এবং উচ্চকিত তাঁর গ্রন্থনামগুলিতেই : 'মেয়েলি পাঠ' (প্রকাশকাল – ২০০০), 'মেয়েলি সংলাপ' (প্রকাশকাল – ২০০৫), 'মেয়েলি আলাপ' (প্রকাশকাল – ২০১২), মেয়েদের লেখালেখি (প্রকাশকাল – ২০০৪) ইত্যাদি।

এমনই আর এক আঙ্গিকগত অভিনবত্বে সমৃদ্ধ রচনা 'রবীন্দ্রনাথ আর ভিকতোরিয়া ওকাম্পো'। এই প্রবন্ধটি আসলে কেতকী কুশারী ডাইসনের লেখা 'রবীন্দ্রনাথ ও ভিকতোরিয়া ওকাম্পোর সন্ধানে' গ্রন্থটির সমালোচনা। এমন অভিনব পদ্ধতিতে গ্রন্থ-সমালোচনা সহসা চোখে পড়ে না। নাটকের মতো নির্মাণ এই রচনার। দুটি চরিত্র-দ্যুতি আর দেয়া। তারা তাদের আলাপনে তুলে আনছে গ্রন্থটির সদর্থক এবং নঞর্থক দিক। বক্তব্যের কথা বাদ দিলেও রচনাশৈলীতেই এক স্বাদু গদ্যের সন্ধান পাই আমরা । কেতকী কুশারী ডাইসনের অপর একটি গ্রন্থ (In Your Blosoming Flower-Garden/ Rabindranath Tagore and Victoria Ocampo, সাহিত্য অকাদেমি, ১৯৮৮) সম্পর্কে আলোচনা আছে 'তোমাকে ভালোবাসি' শীর্ষক অধ্যায়ে। শঙ্খ ঘোষের 'ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থটির সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা করে কেতকীর একরৈখিক দর্শনের কিছুটা সমালোচনা করা হয়েছে এই প্রবন্ধে।

প্রাবন্ধিক অনায়াসে নিজেকে 'অপন্ডিত' বলে চিহ্নিত করেন ২০০৯ সালে প্রকাশিত তাঁর একটি প্রবন্ধ সংকলনের নামকরণে।গ্রন্থটির নাম 'বিশ শতকের কথাসাহিত্যে অপন্ডিতের পাঠ'। এই গ্রন্থের একটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের লেখায় নারীভাবনার তুলনামূলক আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন – "ভূমিকাপালনে গভীরভাবে আস্থা রেখেও মেয়েরা যে শক্তির পরিচয় দিতে পারে, শরৎচন্দ্রের দেনাপাওনা এবং ষোড়শী-র ভৈরবী চরিত্রে যার পরিচয় আছে, রবীন্দ্রনাথ তা বুঝতেই চাননি। ষোড়শী সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথ যে চিঠি দিয়েছিলেন তা নিতান্তাই একপেশে। ..... পল্লীসমাজের ক্ষমতাতন্ত্র, তার দুর্নীতির বিরুদ্ধে ষোড়শী যে রুখে দাঁড়ায়, কোনো গ্রামীণ মেয়ের মধ্যে সেই সাহস, ক্ষমতাহীন সাধারণ মানুষের প্রতি তার ভালোবাসা – অলীক বা অবাস্তব বলে আমার তো কখনো মনে হয়নি। মনে হলে রক্তকরবীর ঈশানী পাড়ার নন্দিনীকেও তো অলীকই ভাবতে হতো।"[৭]

রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় মেয়েরা কেমনভাবে প্রতিভাত হয়েছে, সেকথা নিজস্ব ভাবনার আলোতে তুলে ধরেন সুতপা ভট্টাচার্য তাঁর 'রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্যে নারী'গ্রন্থটির প্রায় প্রতিটি প্রবন্ধে (প্রকাশকাল – জুলাই, ২০১১)। রবীন্দ্রনাথ এবং নারীবাদ- দুটোই দীর্ঘদিন ধরে তাঁর চর্চার বিষয়। তাই কথাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ কীভাবে মেয়েদের উপস্থাপন করেছেন সেই অন্বেষণেরই ছাপ থেকে যায় এই গ্রন্থটির সর্বত্র।

'সে নহি নহি' গ্রন্থের সূচনায় সমালোচকের যে বক্তব্য ছিল - 'অর্ধেক তো নয়, সম্পূর্ণ মানবীই তো হতে চাই আমরা' সেই বোধ, সেই অনুভবই ফুটে ওঠে তাঁর প্রতিটি গ্রন্থের সহজ চলনের, সাবলীল, ঝরঝরে গদ্যের স্পন্দনে। রাবীন্দ্রিক ভাবাদর্শের বিশ্লেষণের নিজস্ব নারীবাদী বা 'মেয়েলি' দৃষ্টিকোণে সমৃদ্ধ এই প্রয়াস বাংলাসাহিত্যে, অন্ততপক্ষে বিদ্যায়তনিক চর্চায় অন্যরকম মাত্রা যোগ করেছে।

তথ্যসূত্র:

১) সে নহি নহি, সুতপা ভট্টাচার্য, সুবর্ণরেখা, বৈশাখ ১৪১১ [প্রথম সংস্করণের ভূমিকা] পৃ:৮।

২) ঐ।

৩) ঐ, পৃ: ৫২।

৪) ঐ, পৃ: ৫৬।

৫) ঐ, পৃ: ১০-১১।

৬) 'যোগাযোগ- এর পরের কথা', মেয়েলি আলাপ, সুতপা ভট্টাচার্য, পুস্তক বিপনি, আগস্ট,২০১২, পৃ: ১৬৭।

৭) নারীভাবনা – রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্র, বিশ শতকের কথাসাহিত্য অপন্ডিতের পাঠ,সুতপা ভট্টাচার্য রত্নাবলী, জানুয়ারি ২০০৯, পৃ: ২৬-২৭।